অভাগিনীর অশ্রুজলে ধুসর মরুতে প্লাবন

বনি আমিন

স্রষ্টা তার আদমভুবন সৃষ্টির পর থেকে অদ্যাবধি সর্বত্র মাইগ্রেশন [হিজরত] লেগেই আছে। ধর্ম মতে পৃথিবীতে প্রথম মাইগ্রেশন পেয়েছিলেন শ্রীমান আদম ও তার জীবন সঙ্গিনী শ্রীমতি হাওয়া। তারা মাইগ্রেশন পেয়েছিলেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। আত্মাভিমানি দেবদুতদের ষড়যন্ত্রের শিকার এই হতভাগা জুটিকে সৃষ্টিকর্তা অর্ধচন্দ্র দিয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়ন করে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন। কথিত আছে রাবণের লঙ্কা রাজ্যের মধ্যভাগে অবস্থিত গহিণ অরন্যে আচ্ছাদিত একটি পর্বতে উক্ত জুটি প্রথম অবতরণ করেছিলেন। সেখান থেকে অতঃপর পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে তাদের ছেলে হাবিল ও কাবিলকে নিয়ে পৃথিবির পবিত্রভুমি বলে পরিচিত খোর্মা খেজুরের দেশ আরবে তারা মাইগ্রেশন [হিজরত] করে আসেন। তারপর থেকে আদমের বংশবিস্তার চলছে এবং সেই সাথে চলছে মাইগ্রেশন, একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। যেমন ইংরেজরা এসেছিল ভারতে, ভারতীয়রা গিয়েছে ক্যারাবিয়া, আফ্রিকা ও ত্রিনিদাদে, আর তামিলরা (এ্যাবোরোজিন) এসেছিল অষ্ট্রেলিয়াতে, বাংলাদেশীরা আবাদ করেছিল শ্রীলঙ্কা এবং মোঙ্গলিয়ানরা গেছে তুরুষ্ক, স্কটল্যান্ড, কানাডা ও সাইবেরিয়াতে। থেমে নেই পৃথিবী এবং যতকাল এই পৃথিবী সৌরজগতে ঘুর্ণায়মান থাকবে ঠিক ততকালই আদম সন্তানরা প্রজন্ম থেকে প্রজান্মন্তরে ভুপৃষ্ঠের উপর আবর্তিত হতে থাকবে।

শ্বাশত এই মাইগ্রেশন নিয়মটি কখনই নিরন্তর আনন্দময় নয়, হওয়ার কথাও ছিল না। কেউ নিজের স্মৃতিবিজড়িত মার্তৃভুমি, আজন্ম পরিচিত পরিবেশ ও স্বজনদের ছেড়ে ভীনদেশে নিরঙ্কুশ আনন্দ পেতে পারে না। ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদ [সঃ] সখের বশে মদিনায় মাইগ্রেশন করেননি। অর্থনীতি, শান্তি, নিরপত্তা অথবা আবেগ যেকোন একটি অথবা সমষ্টিগত কারনে একজন আদম সন্তান ঘরছাড়া হয়ে থাকেন। উক্ত কারনে এযাবত প্রায় এক কোটি বঙ্গসন্তান জগতের বিভিন্ন দেশে মাইগ্রেশ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। বুকে হাত দিয়ে এবং চোখে চোখ রেখে কোন প্রবাসী বাংলাদেশী শীর উঁচু করে কখনো বলতে পারবেন না তিনি উপরোক্ত কোন কারন ছাড়া দেশের বাইরে এসেছেন। তারপরেও অনেক দ্বিমুখী ব্যক্তিত্ব নির্লজ্জের মত দাবী করেন 'স্বেচ্ছায় নির্বাসিত' অথবা নিতান্তই সখের বশে প্রবাসে এসেছেন। এশ্রেনীর লোকগুলো দেশের বাইরে এসেই নিজেদেরকে আর্য্য রক্তধারক অথবা নবাব বংশের অথবা জমিহারা কোন জমিদারের বংশদর বলে দাবী করে থাকেন। দেশে থাকতে এরা সকলেই ধনী ছিল, চর্তুদিকে নওকর ও পাইক পেয়াদায় ঘেরা ছিল এদের জীবন এবং সোনার চামচ দিয়ে রূপার থালা থেকে ভাত নিয়ে খেতেন বলে অহেতুক পেঁচাল পাড়েন। তৎকালীন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাতীর মহম্মদের পূর্বপুরুষরা চাটগাঁ'র দক্ষিনাঞ্চল টেকনাফ [আরাকান রাজ্য] থেকে এসেছিলেন বলে কথিত আছে। সেই সুত্রধরে ইদানীং সিডনীর কিছু বাংলাদেশী নিজেদেরকে মাহাথিরের বংশধর বলেও পরিচয় দিতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশী কারো উচ্চতা যদি 'পাঁচ ফুট বারো ইঞ্চি'র কাছে হয়ে থাকে এবং গায়ের রঙ একটু ফর্সা হয় তবে তাদের অনেকেই নিজেদেরকে সম্রাট শেরশাহ অথবা আর্য্য বংশদ্ভুত বলেও দাবী করে থাকে। [উল্লেখ্য দিল্লীর নীতিপরায়ন ও চরিত্রবান সম্রাট শেরশাহ্'র মত মহান শাসকও সাম্রাজ্য পরিদর্শনকালীন রাজশাহীতে এসে মুতা-বিবাহ করে একজন বঙ্গললণাকে মার্তৃত্বের তৃপ্তি দিয়ে গিয়েছিলেন।] যাদের চোখ কিছুটা ক্ষুদ্রাকৃতির ও কুঁতকুঁতে হয়ে থাকে তারা নিজেদেরকে রেঙ্গুন অথবা মাহাথীরের বংশের সাথে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। নিজ বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকে তৎকালীন ব্যবসা সমৃদ্ধ রেঙ্গুনে তাদের পুর্বপুরুষদের সওদাগরী বা আড়তদারীর গল্পও ফেঁদে বসেন, যা নিতান্ত হাস্যকর। উদ্ভট চরিত্রের এ আদমরা সুযোগ বুঝে নিজের নামের সাথে বিভিন্ন রকম ফালতু পদবীও জুড়ে নেন। শুনলে মনে হয়, 'ছাল নাই কুত্তা, বাঘা নাম তার'। বাংলার মাটিতে এরূপ অবাঙালী ধাঁচের ব্যক্তিরা মুলতঃ অতীত যুগের বহিরাগত লম্পট শাসক ও ধর্ষকামী জলদস্যুদের রক্তধারা

বহন করছে বলে অজস্র প্রমাণ আছে। আর সেজন্যে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, 'বাংলাদেশ ইজ এ মেল্টিং পট অব রেসেস।' সাধারণত যাদের সত্যিকার অর্থে দেশে কোন পারিবারিক পরিচিতি নেই অথবা প্রবাসে নিজ পেশার পরিচয় দিতে লজ্জা পান অথবা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার নিতান্ত অভাব, শুধু এই শ্রেনীর লোকগুলোই দেখা যায় প্রসংগহীন অহেতুক 'সোনার চামুচ, রূপার থালা অথবা রেঙ্গুনে'র গল্প বলতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এমনকি নিকট অতীতে কি প্রকৃয়ায় অথবা কি তেলেছমাতি করে এরা অষ্ট্রেলিয়াতে থাকার অনুমতি পেলেন সেটাও বেমালুম ভুলে গিয়ে এরা বন্ধু বান্ধবদের কাছে নিজের মাইগ্রেশন বিষয়ে বর্নাঢ্য ও এ্যাডভেঞ্চারমুলক কাহিনী বলে থাকেন। *[উক্ত বিষয়টি পরবর্তিতে বিস্তারিত অন্যকোন প্রতিবেদনে আলোচনা করবো।]*

হেমায়েত করিম দীর্ঘ একুশ বছর ধরে অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন। শুধুমাত্র একটু অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাধ নিতে তিনি তার সদ্য বিবাহিত ও গর্ভবতি স্ত্রী জুলেখাকে রেখে দেশ ছাড়া হয়েছিলেন। প্রানপতি হেমায়েতকে একনজর দেখার অপেক্ষায় গত একুশ বছর ধরে জুলেখা প্রহর গুনছে। তার দীর্ঘদিনের অশ্রুধারাকে কাপ্তাই হ্রদের মত বাঁধ দিয়ে যদি হঠাৎ ছেড়ে দেয়া হতো তবে হয়তবা সেই প্লাবনে ভেসে যেত কোন বিশাল জনপদ। হেমায়েত অষ্ট্রেলিয়ায় আসার তিনমাস পর তার মেয়ে সখিনার জন্ম হয়। জন্মদাতাকে ছবিতে দেখেছে, ফোনে কথা বলেছে, দুজনের মাঝে লেখালেখি হয়েছে অনেক, কিন্তু দেখা হয়নি কখনো। গত বছর সখিনার বিয়ে হয়ে গেল এবং চলতি বছরে সে সন্তান সম্ভবা। আর কয়দিন পরে হেমায়েত পিতামহ হবেন, দৌহিত্রকে দেখবেন ছবিতে, বাস্তবে নয়। জিবীত থেকেও তিনি তার পরিবারের সদস্যদের কাছে ছবি হয়ে আছেন। ভাগ্যবিধাতা হেমায়েতকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দিয়েছে বটে তবে তার বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছে তার জীবনের অমুল্য অনেক কিছু। অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে ঝাউবনের মত সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা সুউচ্চ অট্টালিকার ছায়ায় ও ইটের পাঁজরে লুকিয়ে আছে এরকম হাজারো বাংলাদেশী হতভাগাদের কাহিনী। যাদের নীরব কান্না কেউ শোনেনা। শারীরিক ক্ষমতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সোনার হরিণের সন্ধানে এসে অনেকে এখানে 'হিজরতি আইনে' ফেঁসে গেছেন। অনেকটা বড়শীর উল্টো আলের মত, মশৃন হয়ে বিঁধলেও বের করা কষ্ট। কত হেমায়েত যুগের পর যুগ নিঃসঙ্গ ও বিরহে দিনযাপন করছেন ইষ্টক জঙ্গল এই সিডনী নগরীতে। কঠিন বাস্তবতার এই সন্ধিক্ষণ থেকে মুক্তি পেতে অনেকে তাদের ফেলে আসা স্ত্রীকে নানা কায়দায় অষ্ট্রেলিয়ায় এনেছেন। কেউ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে অথবা ভাইয়ের সাথে বিয়ে পড়িয়েও স্ত্রীকে এখানে এনেছেন। সিডনীর একজন বাংলাদেশী পদস্থ কর্মকর্তা ফারদীন খান, যিনি তার তালাকপ্রাপ্ত একমাত্র বোনকে নিজের স্ত্রী দেখিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় এনেছিলেন। 'কাগজ' থাকলে বোনের জন্য হয়তবা পাত্র পেতে অসুবিধা হবেনা ভেবে তিনি উক্ত ন্যাক্কারজনক কাজটি করেছিলেন। পরিবহন কর্মী সগীর উদ্দিন দীর্ঘদিন আইনী প্যাঁচে আটকে থাকা তার আপন ভাইয়ের বিরহ ঘুচাতে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেখিয়ে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করে এনে দিয়েছেন সিডনীতে। অনেকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে অথবা অন্য কারো 'ডিপেনডেন্ট' দেখিয়ে স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসছেন। উক্ত পদ্ধতীটি এখন সিডনী তথা অষ্ট্রেলিয়াতে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যারা নিজের আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্বের সাথে কখনো

আপোষ করতে পারেন না তাদের হয়েছে যতকষ্ট। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের মত এরা সর্বদা স্যান্ডউইচ হয়ে চাপা থাকে। তাদেরকেই ধুঁকে ধুঁকে বিরহের কঠিন উত্তাপ সইতে হয়।

সম্প্রতি সিডনীতে আগত বাংলাদেশের একটি ব্যান্ডদলের সাথে 'প্রবাসী-বিচ্ছিন্ন' অনুষ্ঠান আয়োজকের স্ত্রী এসে দিনকয়েক ঘুরে গেলেন। সংস্কৃতি সেবক শামসুদ্দোহা বাবলু প্রায় গত নয় বছর ধরে সিডনীতে বসবাস করছেন। যোগ্য পিতা ও দায়িত্ববান স্বামীরা প্রবাসে যা করে থাকেন তিনিও তাদের ব্যতিক্রম নন। উল্লেখ্য, গত দুবছর আগে বাংলাদেশে তার একমাত্র ছেলে গোল্ডেন জিপিএ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল। সবার মত সোনার হরিণের আশায় বাবলুও সিডনী এসেছিলেন, অতঃপর জড়িয়ে গেছেন 'হিজরতি আইন'এর গেঁড়াকলে, দেশে ফিরতে পারছেন না। ফেলে আসা একমাত্র সন্তান ও প্রেয়সী স্ত্রীকে একনজর দেখার সুযোগ তার হয়নি দীর্ঘ ন'বছরে। আরো অনেক বাংলাদেশী নিষ্ঠুর স্বামী ও স্বার্থপর পিতার মত শুধুমাত্র 'কাগজ' প্রাপ্তির লোভে বাবলু অষ্ট্রেলিয়াতে পুনরায় বিয়ে [শ্যাম ম্যারেজ] করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। সুযোগ থাকা সত্তেও বিশ্বস্থ পতি বাবলু নিজ স্ত্রীর বুকে খঞ্জর বসায়নি, কেড়ে নেয়নি তার সন্তানের হাসি। স্বাভাবিক কারণে দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন তার অভাগী স্ত্রীকে শুধু এক পলক দেখার জন্যে তিনি সামান্য মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন বটে। অন্যায় হলেও সেটা আমার কাছে, আমার মতে একটি 'পবিত্র অন্যায়'। নিজের সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত ব্যান্ডশোতে অংশগ্রহনকারী শিল্পীদের সাথে সত্যিকার পরিচয় গোপন করে তিনি তার স্ত্রীকে সম্প্রতি সিডনীতে বেড়াতে এনেছিলেন। উক্ত বিষয়ে তাকে একান্ত সহযোগীতা করেছিলেন একজন বাংলাদেশী হৃদয়বান ব্যক্তি চৌধুরী শহিদুজ্জামান। বাবলুর সাথে দীর্ঘ যোগসুত্রিতার কারনে স্পন্সর হিসেবে জামান এগিয়ে আসেন। কোন কারনে বাবলুর স্ত্রী তার ভিসায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি অষ্ট্রেলিয়া থেকে বের না হতো তাহলে একজন স্পন্সর হিসেবে ধনে ও মানে মারাত্মকভাবে জখম হতেন উক্ত জামান। সিডনীতে অনেক ব্যক্তি অতিতে তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে বেড়াতে এনে স্পন্সরের বুকে ছুরি মেরেছিলেন, প্রমান আছে শত শত। দীর্ঘবিচ্ছেদের পর প্রনয়নীকে কাছে পেয়ে কার না সাধ হয় আরো দুদিন বেশি কাছে ধরে রাখতে। জানালার আর্শি ভেদ করে আসা প্রভাতের ক্ষীণ আলোতে কঙ্কনের রিনিঝিনি আওয়াজ তুলে হাতে এক কাপ চা নিয়ে নিদ্রা জড়ানো প্রানপতির শিয়রে দাঁড়াতে কার না সাধ হয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদ পর সাময়িক মিলনকালে কে না চায় প্রতি রাতে বাসর সাজাতে? কিন্তু সকল সাধ আর আহ্লাদকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন বাবলু। তিনি সিডনীতে প্রথমবারের মত একটি নজির সৃষ্টি করেছেন। মাত্র পাঁচদিন পরেই বিদায় দিয়েছেন তার প্রাণ প্রিয়াকে। রানওয়ের বুক চিরে বিকট গর্জন তুলে হাওয়াই জাহাজটি যখন দৌড়াচ্ছিল এবং অবশেষে উড়ে গিয়ে নীল আকাশে ধীরে ধীরে মিলে গেল তখন সে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে তার হৃদয়ে যে ক্ষরণ হয়েছে সে কথা কে বুঝবে। বাবলু জানে না কবে তার স্ত্রীর সাথে আবার দেখা হবে, সাঁঝের জোনাকীর মৃদু আলোতে আঙিনায় বসে কবে আবার মুখোমুখি দুজনের কথা হবে। সকল কিছুই অনিশ্চিত। যেকোন উপায়ে একজন স্বামী অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘ বিচ্ছেদ পর ক্ষণিকের জন্যে নিজের স্ত্রীকে কাছে পেতে চাইতে পারে, তাতে যদি সত্যিই অন্যায় হয়, তবে সে অন্যায় কতটুকু? বন্ধুর বিশ্বাসকে মুল্য দিয়ে এবং অষ্ট্রেলিয় আইনকে সম্মান করে বাবলু যে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা থেকে অনেকের শিক্ষা নেয়া উচিৎ।

যে যেভাবেই আমরা এদেশে থাকি না কেন, উদ্দেশ্য আমাদের ভিন্ন নয়। কাউকে আলাদা করে দেখার কোন কারণ নেই, আমরা সকলেই গ্রাম বাংলার সন্তান। যদি খাঁটি বাঙালী হয়ে থাকি তাহলে সকলের গায়ে এখনো কাঁদামাটির গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আর্য্য বর্ন, নবাবের বংশধর অথবা রেঙ্গুনের সওদাগর হলে ভিন্ন কথা।

বনি আমিন, সিডনী, ১৮/০৩/২০০৯